রক্তের মতো লাল জলপ্রপাতের পানি

অ্যান্টার্কটিকার টেইলর হিমবাহের মধ্যে আছে একটি জলপ্রপাত। খুব ধীরে ধীরে সেখান থেকে বের হয়ে আসে পানি। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, এই পানির রং রক্তের মতো লাল। বরফরাজ্যে এমন আশ্চর্য রঙের জলের রহস্য কী?

ব্লাড ফলস নামে পরিচিতি পাওয়া এই আজব জলপ্রপাত বিজ্ঞানীদের প্রথম নজর কাড়ে ১৯১১ সালে। তারা অবাক হয়ে দেখলেন, হিমবাহের একটি অংশ রক্তের মতো লাল। জানা যায়, ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ও অভিযাত্রী টমাস গ্রিফিথ টেইলর প্রথম বিষয়টি খেয়াল করেন। তার নামেই হিমবাহটির নাম রাখা হয় টেইলর হিমবাহ। টেইলরসহ শুরুর দিকের অন্য গবেষকেরা ধরে নিয়েছিলেন, এমন বিচিত্র রঙের জন্য দায়ী কোনো শৈবাল বা শেওলা। তবে পরে জানা যায়, এই ধারণা ঠিক নয়।

অ্যান্টার্কটিকার ম্যাকমার্ডো ড্রাই ভ্যালিতে টেইলর হিমবাহ এবং আজব এই জলপ্রপাতের অবস্থান। একে অবশ্য আমাদের দেখা সাধারণ জলপ্রপাতগুলোর সঙ্গে মেলাতে পারবেন না। বরফরাজ্যের হিমবাহের ফাটল গলে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে রক্তের মতো তরল। এখানকার তাপমাত্রা ১.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা হিমাঙ্কের নিচে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই নিম্ন তাপমাত্রায় খুব সামান্যই গড়ায় জলপ্রপাতের লাল তরল। এ কারণে অনুসন্ধানের কাজটা ছিল আরও কঠিন।

অবশ্য জলপ্রপাতের পানির লাল রং ঘিরে যেমন রহস্য তৈরি হয়, তেমনি এই বরফরাজ্যে প্রবহমান পানি কীভাবে এল, তা নিয়েও কৌতূহল ছিল গবেষকদের। শেষ পর্যন্ত সমাধান হয় দুটি রহস্যেরই। কয়েক বছর আগে জার্নাল অব গ্ল্যাসিওলজিতে ছাপা একটি জার্নালে বেরিয়ে আসে আসল সত্য। হিমবাহের তলের ছবি তোলা সম্ভব হওয়ায় রহস্যের সমাধান সহজ হয়। এতে দেখা যায়, হিমবাহের নিচে পাতাল নদী আর হ্রদ আছে। আনুমানিক ২০ লাখ বছর আগে এই হ্রদের পানি হিমবাহের নিচে আটকে যায়। আর এই হ্রদ আর নদীর জলে বেশ উচ্চমাত্রায় লবণ থাকে। এগুলো আয়রন বা লোহায়ও পূর্ণ।

পানি প্রবাহের পেছনে বড় ভূমিকা লবণের। আর লোহার কারণেই জলপ্রপাত থেকে রক্তলাল তরল বের হয়। গবেষণায় দেখা যায়, এই লবণের উপস্থিতির কারণে জমে না গিয়ে জলপ্রপাতের লাল তরল প্রবাহিত হয়। কাজেই হিমবাহের নিচের অস্বাভাবিক লবণাক্ত হ্রদটি গোটা বিষয়টিতে একটি বড় ভূমিকা রাখে। নোনা জলের বিশুদ্ধ জলের চেয়ে হিমাঙ্ক বা ফ্রিজিং পয়েন্ট কম। এটি হিমায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপ ছেড়ে দেয়, যা বরফ গলিয়ে পানিকে প্রবাহিত করতে সাহায্য করে।

অর্থাৎ, পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল হিমবাহটিতেও জলের প্রবাহ আছে। কিন্তু এই পানিতে এতই বেশি লোহা আছে যে এটি আশ্চর্য লাল রঙের হয়ে ওঠে। সেই সূত্রেই জন্ম রক্তলাল এক জলপ্রপাতের। গবেষণায় দেখা যায় লবণপানির ১৫ লাখ বছর লাগে হিমবাহের নানা ফাটলের ভেতর দিয়ে গিয়ে রক্তলাল জলপ্রপাতের জন্ম দিতে।

গবেষণায় নদী-হ্রদের জলে লোহাসমৃদ্ধ লবণপানির পরিমাণ বের করারও চেষ্টা করা হয়। জলপ্রপাতের কাছাকাছি এই লৌহ বা আয়রন-সমৃদ্ধ লবণ জলের পরিমাণও বেশি। পানির তাপমাত্রার সঙ্গে লবণের পরিমাণেরও সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় বিজ্ঞানীদের গবেষণায়। হিমবাহের মধ্যে বিভিন্ন আকারের ফাটলগুলোর ভেতরে নোনা জল বা নোনা অংশ প্রবেশ করে। তার পরই লবণজল জমতে শুরু করে। এদিকে এর মধ্যে সুপ্ত উষ্ণতা চারপাশের বরফকে উত্তপ্ত করতে শুরু করে। আর এ সময় ফাটলের ভেতর থেকে জলপ্রপাতের জল হিসেবে বেরিয়ে আসে আয়রন বা লোহাসমৃদ্ধ লাল তরল।

তবে এই রক্তলাল জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছানো মোটেই সহজ নয়। এটি ড্রাই ভ্যালি নামের যে এলাকায় অবস্থিত, সেখানে যাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকমার্ডো স্টেশন থেকে কিংবা নিউ জিল্যান্ডের স্কট বেস থেকে হেলিকপ্টারে। কিংবা রোজ সাগর থেকে যেতে হয় জাহাজে চেপে। তাই সাধারণ পর্যটকদের এই বিস্ময়কর বিষয়টি দেখার সৌভাগ্য হয় না।

মরুভূমিতে গরম জলের ঝরনা

মরুভূমির মধ্যে পানির দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। সেখানে নেভাদার এক মরুভূমিতে পাবেন একটি উষ্ণ প্রস্রবণ বা গরম জলের ঝরনা। ছয় থেকে ১২ ফুট পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে গরম পানির ফোয়ারা। নিশ্চয় ভাবছেন এটা এখানে এলো কীভাবে? যখন শুনবেন এটা তৈরির পেছনে মানুষের হাত আছে আর অঘটনে এর

জন্ম, তখন নিশ্চয় চোখ কপালে গিয়ে ঠেকবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর নেভাদার ব্ল্যাক রক মরুভূমির মধ্যে ৩ হাজার ৮০০ একর আয়তনের ফ্লাই র‍্যাঞ্চ। সেখানেই দেখা পাবেন আশ্চর্য ওই উষ্ণ প্রস্রবণের, নাম ফ্লাই গিজার। তা একটা নয়, মোচাকৃতি তিনটা কাঠামো দেখবেন এখানে পাশাপাশি। এটা আরও বেশি নজর কাড়ে নানা রঙের মিশেলের কারণে। এমনিতে উচ্চতা বেশি নয়, ফুট ছয়েক। তবে যে খুদে ঢিবি বা টিলাটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেটিকে বিবেচনায় আনলে উচ্চতাটা গিয়ে ঠেকবে ১২ ফুটে। তবে এর থেকে বের হওয়া গরম জলের ফোয়ারা ১২ ফুট পর্যন্ত উঠে যায়।

তবে ফ্লাই গিজারের সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, পুরোপুরি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি নয় এটি। আরও পরিষ্কারভাবে বললে, জিওথার্মাল এনার্জির (পৃথিবীর মধ্যে থাকা উত্তাপ) সঙ্গে মানুষের ভূমিকা মিলিয়েই এর জন্ম। মরু এলাকা হলেও ফ্লাই র‍্যাঞ্চ গড়ে উঠেছে নেভাদার হুয়ালাপাই জিওথার্মাল এলাকায়। মজার ঘটনা, আসলে এই এলাকায় প্রথম যে গিজারের জন্ম হয়, সেটি কিন্তু ফ্লাই গিজার নয়। ঘটনার শুরু ১০০ বছরের বেশি আগে। মরুকে কৃষিকাজের উপযোগী করতে গিয়ে এর জন্ম।

ওই সময় একটি কূপ খনন করতে মাটির তলার উত্তপ্ত পানির রাজ্যে আঘাত করে বসেন কৃষিশ্রমিকেরা। ওই পানির তাপমাত্রা ছিল ২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। তবে এই উত্তপ্ত পানি কৃষিকাজে ব্যবহারের উপযোগী না হওয়ায় একে এভাবেই ফেলে রেখে চলে যান তারা। কিন্তু এর ফলে জন্ম হয় এক উষ্ণ প্রস্রবণের। সেখান দিয়ে উত্তপ্ত পানি বের হতে থাকে বছরের পর বছর ধরে।

পরের ঘটনাটি আরও কয়েক যুগ পরের। ১৯৬৪ সালে একটি এনার্জি কোম্পানি প্রথম কূপটার কাছেই দ্বিতীয় আরেকটি কূপ খনন করে। তবে এ ক্ষেত্রে আবার পানি তাদের চাহিদামতো গরম ছিল না। এবার এখানে আরেকটি উষ্ণ প্রস্রবণের জন্ম হয়ে ফোয়ারার মতো উষ্ণ পানি বের হতে থাকে। আর এই কূপে যথেষ্ট পানির চাপ থাকায় মূল গিজারটি শুকিয়ে যায়।

বলা হয় কোম্পানিটি কূপ খননের ফলে জন্ম নেওয়া গিজারটির মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তখন। তবে প্রবল গতির উষ্ণ জল খুব বেশি দিন আটকানো সম্ভব হয়নি। আর এভাবেই জন্ম দ্বিতীয় উষ্ণ পানির ঝরনার, যেটিকে আমরা ফ্লাই গিজার হিসেবে চিনি। এদিকে আগের উষ্ণ প্রস্রবণ ও এবারেরটার পানির ক্যালসিয়াম কার্বোনেটসহ অন্য খনিজগুলো জমে তিনটি মোচাকৃতির কাঠামো তৈরি করে। শুরুতে আকারে ছোট থাকলেও ধীরে ধীরে এগুলো বড় হয়। মোটামুটি ছয় ফুট উচ্চতার এই কাঠামোগুলোর মুখ দিয়েই তীব্র গতিতে উত্তপ্ত পানি বেরিয়ে আসতে থাকে।

২০০৬ সালে উইলস গিজার নামে আরেকটি গরম জলের ঝরনার খোঁজ পাওয়া যায় এ এলাকায়। এর জন্ম অবশ্য প্রাকৃতিকভাবে। তবে ফ্লাই গিজারের সৌন্দর্যের কারণে এটির প্রতি মানুষের আগ্রহ কমই। মোটামুটি নানা খনিজ আর উষ্ণ পানিতে বাস করতে পারে এমন শৈবাল মিলিয়ে সবুজ, লালসহ নানা রঙে রাঙিয়েছে ফ্লাই গিজারের মোচাকৃতির কাঠামোগুলোকে। আর এটাই উষ্ণ প্রস্রবণটাকে রীতিমতো অপার্থিব এক সৌন্দর্য দিয়েছে।

ফ্লাই গিজারটির আগের মালিক ছিলেন টড জেকসিক নামের এক ব্যক্তি। পরে ২০১৬ সালের জুনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বার্নিং মান প্রজেক্ট ৬৫ লাখ ডলার দিয়ে ফ্লাই র‍্যাঞ্চটি কিনে নেয়। মরুর বুকে হলেও ফ্লাই র‍্যাঞ্চে জলা জায়গা, ঝরনা আর ঘেসো জমি আছে। এগুলোকে রক্ষা করাই প্রতিষ্ঠানটি উদ্দেশ্য।

নেভাদার ওয়াশোও কাউন্টির গারলাক শহর থেকে মোটামুটি ২০ মাইল দূরত্বে ফ্লাই গিজারের অবস্থান। স্টেট রুট ৩৪ থেকে খুব বেশি নয় এটি। এমনকি রাস্তা থেকেই চোখে পড়বে এটি। ২০১৮ সালের মে থেকে র‍্যাঞ্চ এলাকাটিকে সাধারণ মানুষের দেখার সুযোগ তৈরি হলেও চাইলেই জায়গাটির একেবারে কাছে যাওয়া যায় না। এখানকার পরিবেশ রক্ষার কারণে সীমিত আকারে পর্যটকদের দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণত ১০ জন কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি পর্যটকের একেকটি দলকে আড়াই ঘণ্টায় ফ্লাই গিজার ও আশপাশের এলাকা ঘুরিয়ে দেখানো হয়।